International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-II, September 2014, Page No. 1-6
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ধর্ম নিরপেক্ষতার আলোকে : ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা

ড. বর্ণালী ভৌমিক (ঘোষ)
সহঅধ্যাপিকা ও বিভাগীয় প্রধানা, দশরথ দেব মেমোরিয়্যাল কলেজ (গভঃ), ত্রিপুরা, ভারত

Abstract

During the middle ages the writings related to medieval period in Bengal were mostly based on religious texts. Nevertheless, a few writers have emphasized on the moral and human values such as secularism, human relations. It has been an amazing fact to mention that, the society was hegemonized with religious, superstitious and dogmatic values. At that moment, a dawn in this era has emerged as the writer have emphasized on the feelings of humanities. During the medieval ages 'Purba Banga – Maiman Singha' ballad reveals as an evidence of those values. This analysis is based on secularism based human relations; those were highlighted in the paper.

Key Words: Humanities, Purba Banga, Mayman Singha, Ballad, Medieval period in Bengal

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ধারায় ধর্মসাধনার ভিড়ে সার্থক ঐতিহাসিক চেতনামন্ডিত সাহিত্যের যেমন নজির মেলে না, তেমনি বাংলা ধর্ম নিরপেক্ষ বাস্তবরসোজ্জ্বল কাব্য কবিতার সাক্ষাৎও অল্প পরিমাণেই পাওয়া যায়। এই সকল অল্পলভ্য সাহিত্যসম্ভারের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ গ্রামবাংলার প্রত্যন্তে অবহেলিত এই সকল গীতিকার বিষয়বস্তু, অনেকাংশেই মানবজীবন থেকে উপাদান আহূত করে সিক্ত হয়ে রয়েছে, যেখানে দেবতা ধর্মসাধনার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এই সকল গীতিকায় বিবৃত আখ্যানটি তাই পল্লী লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তব ধর্ম-নিরপেক্ষ জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ধারাপাত।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় সম্পাদিত 'সৌরভ' নামক একটি মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য অনুরাগী চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক এই সকল গীতিকার কয়েকটি লোকগাথা প্রকাশিত হলে, সর্বপ্রথম শিক্ষিত সমাজ ও ব্যক্তির সম্মুখে আসে এই সকল গাথা, অতঃপর এর অপূর্ব কাব্যমাধুর্য বাস্তবজীবনমুখীতা উপলব্ধি করেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইসচ্যান্সেলর সশ্রদ্ধেয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় –এর আনুকূল্যে এবং সাহিত্য ইতিহাসকার আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ ও তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পালাগুলি সংগৃহীত ও ময়মনসিংহ গীতিকা নামে যত্নসহকারে প্রকাশিত হয়।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে, ময়মনসিংহ ও তার চতুর্পাশ্বের অঞ্চলে প্রচলিত দরিদ্র কৃষকদের মুখে গীত বহুপালা এই গীতিকায় স্থান পেয়েছে। তাই সেগুলির বিষয়বস্তুতে ধর্মীয় ব্যাখ্যান, ধর্মসাধনার গূঢ় তত্ত্ব, ধর্মসাধনার প্রনালী স্থান না পেয়ে, স্থান পেয়েছে লৌকিক - গ্রামীন নরনারীর উচ্চতর প্রেমের আদর্শ। ধর্মের বেড়াজালে এইসকল গীতিকার নায়ক-নায়িকারা তাই বাঁধা পড়েনি। পক্ষান্তরে, মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতম আবেদনে, হৃদয়ের প্রেমানুভূতিতে এই সকল গীতিকার প্রকাশ ঘটেছে।

গীতিসংগ্রহক শ্রী চন্দ্রকুমার দে মহাশয়, শ্রদ্ধেয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর আনুকূল্যে ময়মনসিংহ থেকে যে সকল ধর্মনিরপেক্ষ, বাস্তবমুখীন পালাগানগুলি সংগ্রহ করে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে দিয়েছেন, সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল নিম্নলিখিত পালাগুলি ---

ক।। দ্বিজ কানাই প্রণীত মহুয়া পালা - যেখানে হুমরাবেদে, নদের চাঁদ, মানিক, সাধু-সন্ন্যাসী, মহুয়াপালা সই প্রমুখ চরিত্রের সমন্বয়ে মানবিক প্রেমের জয় সূচিত হয়েছে। চিরবিজয়ী প্রেমের দুর্জয় শক্তি তৎকালীন শাস্ত্রের অনুশাসনে বাঁধা না পড়ে লৌকিক নর-নারীর হৃদয় প্লাবল্যই উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

খ।। অনুমানিত বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী প্রণীত মলুয়া পালা - যেখানে চাঁদ বিনোদ, হীরাধর, কাজী, মলুয়া চরিত্রের সমন্বয়ে বিজয়ী প্রেমের অতলান্ত আবেদন হৃদয়গ্রাহ্য হয়েছে। কৌতুহল উদ্দীপক, ত্যাগ-মহিমাখন্ডিত স্বামী বিরহিনী মলুয়ার পূর্বরাগ-অনুরাগ অরুনরাগে উজ্জ্বল।

গ।। নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র পালা - যেখানে যোগশান্ত তপস্বিনী, নিষ্ঠাবতী পূজারিনী চন্দ্রাবতীর প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে জয়চন্দ্রের প্রতি, সেখানে দেবমহিমা, দেবার্চ্চনা, দেববন্দনা প্রকাশ না পেয়ে সাংসারিক শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনপটে অকস্মাৎ লৌকিক প্রেমের স্পর্শ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে এবং মর্মন্তুদ কষ্টের মধ্যে দিয়ে চিত্তশুদ্ধির নির্মলতা চন্দ্রাবতী-জয়চন্দ্র-বংশীদাস প্রমুখ চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।

ঘ।। দ্বিজ ঈশান প্রণীত কমলাপালা -- যেখানে সুধন, কমলা, চিকন গোয়ালিনী, কারকুল, প্রদীপকুমার প্রমুখ চরিত্র কেন্দ্রিক ঘটনার আবর্তনে, নির্ভীক জীবন বোধসম্পন্ন সরল কাহিনী বর্ণিত। এখানেই কমলা প্রবল দীপ্ততায় নারী মর্যাদা রক্ষা করেই মহিলা জনোচিত 'লজ্জাশীলতা'[১]-য় আপন 'বারমাসী'[২] বর্ণনা করেছেন। এ পালাটিতেও ধর্ম ভাবনা ধর্মশাস্ত্রের বেড়াজাল সম্পূর্ণই লুপ্ত।

ঙ।। বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী - প্রণীত দস্যু কেনারাম পালা - যেখানে দস্যু কেনারামের মানসিকতার জীবনের আমূল পরিবর্তন দর্শিত হয়েছে। যদিও মনসামঙ্গল অংশটি পালার প্রয়োজনে এসেছে, কিন্তু হীনদস্যু কেনারামের বংশীদাস সংসর্গে যে হৃদয়ের পরিবর্তন - সেটা দেখানোই পালাকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বলা যায়।

চ।। অজ্ঞাত কবি রচিত রূপবতী পালা - সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের পালা; যেখানে রাজা, রানী, রাজকন্যা সহ রূপকথার আদলে গীত হয়েছে মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, উৎকণ্ঠা-শঙ্কার আলেখ্য।

ছ।। অজ্ঞাত কবিগণের রচিত দেওয়ান ভাবনা পালা সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ এই পালাটিতে সুন্দরী কন্যার বিবাহ জনিত কারণে মায়ের চিরাচরিত উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা-ভাবনা মুখ্য বিষয় হয়েছে। তবে পালা শেষে পরপুরুষের প্রতি ঘৃণা আর প্রাণবন্ধুকে বাঁচাতে, হৃদয়ের পুরুষটির সঙ্গে চিরবিরহজনিত কারণে সুনাই এর আত্মদান মানবিক প্রেমের আস্বাদ যুগিয়েছে।

জ।। অজ্ঞাত কবি রচিত কাজলরেখা পালা সম্পূর্ণই ধর্মনিরপেক্ষ রূপকথা, যেখানে কাজলরেখা, সূইচ রাজা (সূঁচ বিদ্ধ অবস্থায় মৃত ছিল, যাকে কাজলরেখা প্রাণদান করেছে) ও কঙ্কনদাসীর হৃদয় মনোহর, কৌতূহল উদ্দীপ্ত কাহিনী বর্ণিত।

ঝ।। রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ, বানিয়া, নয়ানচাঁদ ঘোষ - এই চতুর্কবি রচিত (কারণ ভনিতায় এই চার কবিরই নাম পাওয়া গেছে) কঙ্ক ও লীলাপালা - যেখানে কঙ্ক ও লীলার ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটেছে লীলার মৃত্যুতে আর লীলার পিতা গর্গর ট্র্যাজিক হাহাকারে, যা চিরকালীন পিতৃহৃদয়ের বেদনা বিধুর চিত্র, এখানেও নেই কোন ধর্মের ঔদ্ধত্য।

ঞ।। মনসুর বয়াতি প্রণীত দেওয়ানা মদিনা পালা - যেখানে মদিনার অপূর্ব হৃদয়মোথিত প্রেম (তার স্বামীর প্রতি) ও চিত্ত সংযমের কাহিনী করুণ রসের আধারে বর্ণিত।

এছাড়াও রয়েছে - ঈশা খাঁ দেওয়ান, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান, মনোহর খাঁ দেওয়ান, ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী, জিরালনী, অসমা, ভেলুয়া সুন্দরী, মদন কুমার ও মধুমালা, গোপিনী-কীর্তন, বিদ্যাসুন্দর, রামায়ণ এর মত অন্যান্য পালাগানগুলিও, যেগুলির মধ্যে কোথাও নর-নারীর সম্প্রদায় নির্বিশেষের প্রেম কাহিনী বর্ণিত, কোথাও বা চরিত্রের সমারোহে মানবজীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, মনন বিবৃত। মূল কথা হল - গাথাগুলি রচনায় তৎকালীন বাস্তব জীবন প্রেক্ষাপট গভীর ভাবে কাজ করেছিল বলেই, পালাকারগণ আপন জীবন থেকে উপাদান আহূত করে গাথাগুলির পূর্ণরূপ দিয়েছিলেন। তাই সেখানে বন্দনা রূপে কোন কোন স্থানে দেব-দেবীর মহিমা সূক্ষ্মভাবে কীর্তিত হলেও মুখ্য স্থানে অবশ্যই রয়েছে বাস্তব লৌকিক নর-নারীর ধর্মনিরপেক্ষ জীবন বোধ।

জীবনের সাপেক্ষেই গীত হয়েছে ময়মনসিংহ - পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলি; সেগুলি তাই আজও যেন মানব জীবন - ঋতুরঙ্গশালায় কুসুমের আমেজ বহন করে। মানুষের জীবনে সূক্ষ্মতম হৃদয় প্রবৃত্তিগুলির ক্যানভাসে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার তুলির আঁচড় হয়েই মনে দাগ কেটে যায়, সম্যব্যথী হয়ে উক্ত চরিত্ররা মানবমনে চিরকাল বিরাজ করে। গ্রাম বাংলার প্রত্যন্তে ছড়িয়ে থাকা এই সকল ভাষার মুখের গীতিকাগুলি বহুকাল শিক্ষিত, উচ্চসাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কেবলমাত্র সরল, হৃদয়বান কৃষককূলই তন্ময় হয়ে গার্হত ধর্মের বাঁধনহীন উক্ত পালাগুলি। তাই বিশুদ্ধ কাব্যরসের সঙ্গে মানব হৃদয়রস এগুলির সঙ্গে সমন্বিত। এছাড়া গ্রাম্য সহজ সরল ভাষার অনাড়ম্বতার যে আমেজ পাওয়া যায়, তাতেই স্নান সেরেছে মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা প্রমুখ চরিত্রাবলী।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রায় সকল সাহিত্যই ছিল ধর্ম-আশ্রিত, তাই কোথাও পৌরাণিক আখ্যান, লোকমানসে বিধৃত ধর্ম-সংস্কার প্রত্যক্ষভাবে স্থান পেত। আবার কোথাও বা সংস্কৃতশব্দের বেড়াজালে লোকসংস্কার, ধর্মচেতনাবোধ মানব হৃদয়কে আপ্লুত করত, সেই নিগূঢ় ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে, ধর্মীয়নাগপাশকে ছিন্ন করে গাথা এই সকল গীতিকাগুলি সত্যিই বিস্ময়কর; যেখানে সংস্কৃত শব্দের শানিত স্বাভাবিকতায় অপূর্ব সুন্দর। গীতিকাগুলিতে বর্ণিত জীবনকথা তাই পল্লীপ্রকৃতির পল্লীমানবের জীবনের অফুরন্ত সুধাস্বরূপ, যেমন - মলুয়া, মহুয়া, মদিনা, কমলা প্রমুখ চরিত্রগুলি যেন গার্হস্থ্য জীবন থেকেই উত্থিত। তাদের সংগ্রামতা, সোচ্চার-নীরব প্রতিবাদের ভাষায় একান্ত হতে পারে সহজ সরল মানবপ্রাণ।

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকাগুলির বেশিরভাগই পূর্বপল্লীবাংলায় ছড়িয়ে থাকা লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করে গ্রথিত হয়েছে বলা যায়। যে সকল কাহিনি, দীর্ঘদিন অশ্রুসিক্ত হয়ে নিরীহ-গ্রাম্য-সরল প্রাণকে উদ্দীপ্ত করেছিল, সেই সকল লোকমুখে প্রচলিত গাথাকেই পয়ারে প্রতিষ্ঠা করেছেন গীতিকবিগণ, তাই শব্দৈশ্বর্যের পরিবর্তে সেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সহজ-সরল হৃদয়ের বেদনাসিক্ত কারুণ্য ও কবিত্ব - যা কবিরা আপন জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলি পড়লে আজও মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। বেদনা-অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে নায়িকাদের পরিণতি দেখলে। তাই চন্দ্রাবতীর জন্য আজও আপামর পাঠক হৃদয় কাঁদে।

সম্ভবত, এই সকল গীতিকা যখন রচিত হয়েছিল, তখনও সমাজ ধর্মশাস্ত্রের নিগূঢ় জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল, প্রচলিত ছিল সমাজের বুকে বিভিন্ন ধরণের সংস্কারের প্রথা, সেই সকল ধর্ম-কুসংস্কারের প্রথার বেড়া অতিক্রম করেই ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সকল ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল - যা বলাই বাহুল্য। তাই তো এই সকল গীতিকার নায়ক-নায়িকারা, ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে, প্রেমের আদর্শ, প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে অসবর্ণ-অসম্প্রদায়গত বিবাহও করে গেছে। কখনও বা প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে আজন্ম কুমারী থেকে গেছে, ধর্মের উপরেও যে হৃদয়ের অধিকার - সেটি যেন বলে গেছে এই সকল গীতিকার

নায়িকারা, তাই গ্রামবাংলার জীর্ণ অচলায়তনে বাঁধা পরা হিন্দু ধর্মের, শাস্ত্রগ্রন্থের ফলিত কৃত্রিম সংস্কারকে হৃদয়ের অনুভূতির প্রাবল্যে জীবন্ত করে তুলেছে। ফলস্বরূপ, ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে পরিগণিত হয়েছে।

এখন বেশ কিছু উদাহরণের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি স্পষ্টরূপে আলোকপাত সম্ভব। কঙ্ক ও লীলা পালায় গর্গ আপন গাত্রপচিত্র নামাবলী দিয়ে গুণরাজ ও বসুমতী পুত্র কঙ্কের গা মুছিয়ে দেয়। শাস্ত্রজ্ঞ-ধর্মীয়-জ্ঞানীব্রাহ্মণ হয়েও সে অস্পৃশ্য এই মুরারী চন্ডালের গৃহে পালিত কঙ্ককে ঘৃণা না করে মানবধর্মের জয় ঘোষণা করে ---

“নামাবলি দিয়া শিশুর বয়ান মুছায়।
সঙ্কেতে লইয়া কঙ্ক নিজ ঘরে যায়।।
দেখিয়া গায়ত্রী দেবী সুখী হৈলা মনে।
পুত্রহীনা পুত্র পাইল মাতা মাতৃহীনে।।”[৩]

আবার এই গীতিকার নায়িকারা কেউ কেউ সমাজের ধর্মীয় অনুশাসনকে উপেক্ষা করে। নিজের পছন্দমত প্রিয়তম মনোনয়ন করে, তার গলায় বরমাল্য দিতেও পিছপা হয়নি, সেখানে আছে জাতি-সম্প্রদায়, কুল-ধর্ম বিসর্জিত হলেও নারী ধর্ম থেকে তারা বিস্মৃত হয়নি। উপরন্তু পতির প্রতি নিষ্ঠায়, কর্তব্যে অতুলনীয়া থেকেছে,

“তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্মতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে উপায় উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।”[৪]

তাই বলা যায়, এই সকল পালায় উচ্চারিত হয়েছে পল্লীবাংলার লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তবজীবনবোধের সুখ-দুখঃ, হাসি-কান্নার আলেখ্য, যে চিত্রগুলিতে জীবনরসে ভরপুর আনন্দ, স্ফূর্তি আমাদের চিরাচরিত-শাশ্বত-অভ্যস্ত-জীর্ণ ধর্মসংস্কারগুলিকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন দেবালয় নির্মাণ করে, আমাদের হৃদয়ে; যা থেকে জন্ম নেয় প্রেমের দুর্মর বলীয়ান দেবমূর্তি, যার আরাধনায় সমাজ রক্ষা পায়। তাই সমগ্র হৃদয়ের অপার অনুরাগে এই সকল পালার জন্ম। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে নেওয়া যেতে পারে দ্বিজ কামাই প্রণীত মহুয়াপালা-টির নায়িকা মহুয়াকে, যার প্রেমের হৃদয়, সমাজের বলিষ্ঠ-ধর্মীয় চাপে পাষাণ চাপা পড়েনি, উপরন্তু শতসহস্র সামাজিক পাপ-পুণ্যের বাঁধাকে অতিক্রম করে নির্ভীকতায় সে চিরবিজয়ী। আনন্দ অশ্রুকে বরণ করে অবশেষে তার মৃত্যু হলেও সে মৃত্যুঞ্জয়ী। তাই প্রেমের বাস্তবতাকে, বিষ্ময়কর নিছনতার সঙ্গে অংকন করে এক শ্রেষ্ঠতম আদর্শে রূপায়িত করেছেন পালাকার, যা সম্পূর্ণই ধর্মনিরপেক্ষ।

আবার চন্দ্রাবতী প্রণীত মলুয়াপালাটি কবি চন্দ্রাবতীর জীবনের সুখ-দুঃখ, বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল বলেই পালার নায়িকা মলুয়া প্রেমের সুনিপুন আদর্শে এতটা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রে মলুয়ার পূর্বরাগটি দর্শনজাত পূর্বরাগের পর্যায়ে ফেলা যায়। একাকিনী ঘাটে জল ভরতে এসে প্রথম নায়কের সঙ্গে দর্শনজনিত কারণে লাজ-লজ্জা তথা প্রথম যৌবনে অঙ্কুরিত নারীহৃদয়ের ভাবাবেগটি, চিরাচরিত নারী হৃদয়ে লজ্জাকেই পাঠকমনে স্মরণ করায়। এছাড়া বাসর ঘরে বাঙলার পল্লীকন্যার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতকারের প্রসঙ্গটিও স্বল্পকথায় অসাধারণ বাস্তবরসোজ্জ্বল। এই পালাতেই মলুয়া যখন প্রতারক কাজীর কুপ্রস্তাবে প্রেরিত কুটনিকে মন্তব্য করে ---

“রোষিয়া কহিল মলুয়া শুনলো কুটনি।।
স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবান তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাঁটা তব পাক্না শিরে।।”[৫]

---তখন কর্তব্যপরায়ন-পতিপ্রাণা-প্রতিবাদী-নারীসত্তারই পরিচয় পাই, যে (মলুয়া) ধর্মসংস্কার পরিপূর্ণ সমাজের বন্ধনকে তোয়াক্কা করে না। তাই মলুয়ার দারিদ্র্য পরিপূর্ণ সংসারগৃহ, স্বামী বিরহ আমাদের অন্তরকে কাঁদায়। তাই এই পালার পূর্বরাগ-মিলন-বিচ্ছেদ-অনুরাগ এর মধ্যে কোথাও ধর্মের অনুশাসন নেই। অভাব, দুঃখ, কষ্ট, উৎপীড়নকে জয় করে এ পালার নায়িকা মহান প্রেমের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র এ পালাই নয়, প্রতিটি পালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম্য কৃষক কবিকূল যে মহীয়সী আদর্শের বাণী সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন, তাতে সমাজ সংসারে দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্মের মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকার জীবনে আগতমান দূর্বিষহ-ই চিত্রিত, যা প্রায়শই ক্ষেত্রে অতিক্রম করে গেছে নায়িকারা। তবে রক্ষণশীল সমাজের সব ঝড়-ঝঞ্ঝা যেন নায়িকাদের জীবন মোথিত করে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু, সেই ঝড় যুঝতেও কোন নায়িকারা ম্লান হয় নি। তাই---

“রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়?”[৬]

একথা সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে।

আবার কবিগণ নায়িকাদের মহান আদর্শের প্রেমের প্রতীকীকম্পনা করলেও মদিনার মত নারীর সন্ধানও দিয়েছেন। যে শতছিন্ন, লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষার বস্ত্রটুকু আপন দেহে পরিধান করে, স্বামীর প্রতিটি কার্যে প্রবল উৎসাহে সাহায্য করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই সে স্বয়ং ধর্মীয়-গোড়া সমাজকে উপেক্ষা করে, জমির আল বাঁধার কাজ যেমন করে, তেমন-ই শালি-ধানের গুচ্ছ স্বামীর হস্তে তুলে দিয়ে কাজের সমানাধিকারটিও বজায় রাখে – এখানেই এ পালার নায়িকা বাস্তবে অতি সাধারণ গ্রাম্য নারী হয়ে ওঠে।

আবার ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালাটিতে লীলার মৃত্যুতে কোথাও নাগরিক কৃত্রিমতার আভাস নেই, নেই ধর্মশাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়ম-রীতি। তাই লীলার পিতা গর্গর ট্র্যাজিক হাহাকার, চিরাচরিত পিতার আর্তনাদেরই সমান। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের ট্র্যাজিক পরিণতির সমতুল্য। এখানে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে গ্রাম বাঙলার এই সকল পল্লীকবিগণ কতটা বাস্তব জীবনমুখী ছিলেন? আর তা না হলে, যখন মধ্যযুগে সমগ্র দেশব্যাপী সংস্কারবোধ আর ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল, তখন কিভাবে আর কেমন মানসিকতাকে অবলম্বন করে এই সকল কবিরা গেঁথে গেলেন ময়মনসিংহ – পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতন এই সকল

উচ্চতর বঙ্গপ্রেমের প্রতিচ্ছবি। আসলে এই সকল গীতিকাগুলি সত্যই গৌরবের সামগ্রী, যেখানে ধর্মীয় মুখস্থ করা শাস্ত্রের ছক বাঁধা নিয়ম নেই, কৃত্রিমতা নেই-পরিবর্তে রয়েছে ভালোবাসা, প্রেম, সুখ, দুঃখ, মমতাবোধ, সহানুভূতিবোধ-এর মত মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক সুকুমার প্রবৃত্তি। তাই তো এই সকল গীতিকাগুলি ধর্ম নিরপেক্ষ লৌকিক মানব-মানবীর কাব্য। আর গীতিকার কন্যা-নায়িকা সকল উপেক্ষাময়ী হয়েও দর্পশীলা, দুঃখে কাতরা হয়েও দুর্জয় - সমাজের বিদ্রোহিনী, সমগ্রধর্মীয় সমাজের নিকট নতশিরা অথচ অভিমানী-আত্মঘাতী মৃত্যুঞ্জয়ী। কারণ, সে যে গৃহলক্ষ্মী, তবু অবগুণ্ঠনবতী নয়। প্রেমের বীর্যে বলীয়ান নারীহৃদয়। তাই তো প্রতারক দেওয়ান কাজীর হাভেলীতে মলুয়া ব্রহ্মচর্যের আসল অর্থ দেখিয়েছে।

মনসার ভাসান-রচয়িতা দ্বিজমাধবের কন্যা চন্দ্রাবতী, দস্যু কেনারাম পালাটির রচয়িতা হলেও চন্দ্রাবতীর জীবনটিও ছিল সুখঃ-দুঃখের দোলায় দ্বন্দ্বপূর্ণ। কারণ, চন্দ্রাবতীও ভালোবেসে হৃদয় দান করেছিলেন জয়চন্দ্রকে, গৃহকর্মের উর্দ্ধে সে প্রেমের মহানতা রামায়ণ রচনায় প্রেরণা জাগিয়েছিল। দুঃখে-যন্ত্রণায় জর্জরিত মানবাত্মাকে কিভাবে সহিষ্ণুতার-ত্যাগের-ভক্তির মোড়কে আবৃত রেখে একনিষ্ঠ প্রেমের সমাধি রচিত করা যায় - জয়চন্দ্রের মৃত্যুর পর চন্দ্রাবতীর হৃদয়ের উত্তরণ সমগ্র পাঠককূলের কাছে সেই প্রমাণই রেখে গেলো। তাই চন্দ্রাবতীর নীরব তপস্যা মূর্তি গৌরব ও সহিষ্ণুতার প্রতীক। যেখানে নেই কোন ধর্মের আড়ম্বর। যদিও কেনারামের ভক্তিতে কিছুটা ধর্মের ছোঁয়ার আঁচ পাওয়া যায়, তবে সে ধর্ম দেববন্দনা ছাপিয়ে গেছে দস্যু কেরারামের হৃদয়-এর পরিবর্তনে, চরিত্রের উত্তরণে। তাই সেখানেও ধর্ম মুখ্য বিষয় না হয়ে হৃদয়াত্মার উন্মোচনই হয়েছে মুখ্য। এছাড়া কাজলরেখা চরিত্রের বাস্তবতার গভীর পরিচয় পাওয়া যায় কাজলরেখা পালাটিতে। সম্পূর্ণ রূপকথার ছলে বর্ণিত এই পালাটিতে গানের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল, কাজলরেখার সহিষ্ণুতা, ভাঙ্গা মন্দিরে কাজলরেখা কর্তৃক কাঙ্কনদাসীকে কুমারের প্রাণলাভ বিষয়ক সূত্রদান, কঙ্কন কর্তৃক কুমারের প্রাণদান ও উভয়ের বিবাহ, অতঃপর দাসীরূপে নিযুক্ত কাজলরেখা ধৈর্য-সহিষ্ণুতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণলাভ - সর্বত্রই ধর্ম নিরপেক্ষ সজীব প্রাণের ছোঁয়া পাওয়া যায়।

তাই আমরা দেখেছি, বঙ্গভূমির এই শস্য শ্যামলীলাপূর্ণ, নদী লালিত্য প্রকৃতি এবং তৎসঙ্গে সরল সজীব মানব-মানবীর লৌকিক সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উচ্ছ্বাস, পালাকারদের দেব-দেবীর গুণকীর্তনের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে বঙ্গমানব-মানবী; যারা পূর্ববঙ্গের জল-হাওয়ায় সম্পৃক্ত, তবে একথাও স্বীকার্য যে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ব-ময়মনসিংহে ব্রাহ্মন্যধর্ম, সংস্কৃতি বা সংস্কৃতশাস্ত্রীয় শৃঙ্খলিত নিয়ম বিস্তার লাভ করেনি, ফলে পালাগানগুলিও ধর্মের নিগঢ়ে আবদ্ধ হয়ে যায় নি। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার হৃদয়বৃত্তিকে সমানাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কবিকূল। কারণ, তখনও সমাজে নারীর স্থান ছিল কিছুটা উচ্চে, সংসারের ব্যূহে নারীকে গৃহবন্দী করে ধর্মের অজুহাত তখনও দেখাননি সমাজশাসকগণ। তাই উচ্চতর প্রেমের আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে। যে প্রেমের দুর্লভ তৃপ্তি, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনার মধ্যে দিয়ে নায়িকারা পেয়েছেন সত্য আদর্শের মর্মবাণী। তাই বিরুদ্ধ শক্তি বারংবার পরাজিত হয়েছে এইসকল প্রেমের গাথায়। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ গ্রন্থের ভূমিকা অংশে (পৃষ্ঠা ১৩) বলেছেন :

> ‘এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই, -- চিরকাল প্রেম বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেন্যা, স্ত্রী-রূপে তিনি জগতের প্রাণ।’

আবার বেশিরভাগ পালাগীতিগুলিতে ‘বিবাহ’ শব্দটি বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। নায়ক ও নায়িকারা নিজেদের পছন্দমত বিবাহ করেছে, আবার বিবাহ পূর্বে আপন হৃদয়ে পুরুষটিকে বা নারীটিকে স্বেচ্ছায় আত্মনিবেদন করার প্রসঙ্গ ও গীতিকায় এসেছে। এক্ষেত্রে, পালাকারগণ নায়ক-নায়িকাকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপনা করেছেন। ভেলুয়া সুন্দরী পালায় আমরা দেখতে পাই, এক আধুনিক নারীকে, যে নারী আপন সত্তা প্রতিষ্ঠায় চিরশাশ্বত, তাই পিতামাতার নিষেধ সত্ত্বেও, তাদের মতের বিরুদ্ধেই বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরকে চির আপন করে নিয়েছে। আবার কোন কোন পালার নায়িকারা আপন পিতার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহিনী হয়েছে, সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে হৃদয়ের পুরুষটিকে স্বামীরূপে বরণ করতেও দ্বিধা বোধ করে নি। তাই দেখি সখিনা তার হৃদয়ের পুরুষ দেওয়ানকে স্বামীরূপে বরণ করার পরও নিজের পিতা ওমর খাঁ এর বিরুদ্ধাচরণ করছে, যুদ্ধও ঘোষণা করেছে ফিরোজ খাঁ এর পালায়।

আবার সোনাই এর ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে, কারণ সামাজিক বিধিনিষেধকে উপেক্ষা করে পরিবারের মাতা ও মাতুলের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে সোনাইও মাধবকে স্বামীরূপে যেমন বরণ করেছে, ঠিক তেমনি পূর্বরাগের অরুণরাগে দীপ্ত কমলার হৃদয়ে প্রদীপকুমারের জন্য ভালোবাসা-প্রেমও বিবাহের বহু পূর্বেই উৎসারিত হয়েছে।

মলুয়া গীতিকায়ও দেখা যায়, প্রেমের প্রথম মধুর স্পর্শে নারী হৃদয়ের অনুভূতি। তাইতো চাঁদ বিনোদকে নারীর ঘাটে সন্ধ্যাবেলা শুয়ে থাকতে দেখে মলুয়া মুগ্ধ হয়ে যায় ---

> “ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
> লাজ-রক্ত হইলো কন্যার পরথম যৌবন।।
> কলসী ভরিয়া কন্যা ঘরেতে ফিরিল।
> কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল।।”[৭]

এছাড়া চন্দ্রাবতী পালায় রসজ্ঞ পাঠক অনুধাবন করতে পারবেন চন্দ্রাবতীর সংযমশীল নারীহৃদয়ের গভীর যন্ত্রণাটিকে। কারণ, অনুরাগিনী, ধর্মশীল, তাপসী চন্দ্রাবতীও তার বিবাহের বহু পূর্বেই জয়চন্দ্রকে আপন হৃদয়ের দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করে মূর্তিরূপে পূজা করে গেছে। তাই দেখি বিবাহের প্রস্তাবের পূর্বেই চন্দ্রাবতী জয়চন্দ্রকে স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছে ---

"চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া।
জয়ানন্দ মাগে বর ধর্ম্ম সাক্ষী দিয়া।।"[৮]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামী, শাস্ত্রগ্রন্থের বিধি-নিষেধ-সংস্কার বা তৎকালীন পৌরোহিত্যের প্রভাব নায়ক-নায়িকার স্বাধীন চিন্তা, ধারা ও আদর্শ প্রেমবোধকে বিচ্যুত করতে পারে নি, তাই তো পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকার বিষয়বস্তুতেই কেবলমাত্র ধর্মের ছায়া পড়েনি, এমন কি প্রতিটি চরিত্রের মানসিকতাও, ধর্মের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বমহিমায়। ফলে গীতিকাগুলি উপস্থাপনায় নায়ক-নায়িকার অতুলনীয় বলা যায়। কারণ, গীতিকাগুলি থেকেই তৎকালীন বঙ্গের সামাজিক-পারিবারিক আদর্শের চিত্রও স্পষ্ট হয়। তাই নাটকীয় গরিমায়, নাট্য মুহূর্ত সৃষ্টিতেও এ গীতিকাগুলি অমূল্য। অর্থাৎ, বিভিন্ন ঘটনাকে ক্রমপর্যায়ে উন্মোচন করেও কৌতূহল পরিপূর্ণ প্রণয় দৃশ্যাবলীকে উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করে পালাকারগণ যথার্থ নাট্যকারও বটে। 'প্রেম' - নামক একটি মহার্ঘ বাস্তব বস্তুকে অবলম্বন করে, তার ত্যাগ-মাহাত্মের প্রকাশ ঘটিয়ে পালাকারগণ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের ধর্মের বন্ধন ভেঙ্গেছেন বলা যায়।

সমগ্র গীতিকাগুলি পাঠ করলে বোঝা যায়, প্রেমকেই ঐহিক-গৃহ জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র প্রকাশ বলে গীতিকবিগণ বিশ্বাস করতেন। তাই ---

"প্রেম ভিন্ন ইহাঁদের ধর্ম নাই— পরস্পরের সাহচার্য ভিন্ন ইহাঁরা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই।"[৯]

এই সকল গীতিকাগুলিতে যেমন ধর্মের গোঁড়ামী, সংস্কার দেখতে পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি দেখা যায় না সাম্প্রদায়িক বিভেদও, তাই তো বহু পালায় হিন্দুনায়িকা, মুসলমান নায়ককে হৃদয়বান স্বামী রূপে বরণ করে নিয়েছে। কোথাও আবার দেখা গেছে মুসলমান নায়কের প্রতি হিন্দু নায়িকার হৃদয়ের পূর্বরাগটিকেও। ফলে প্রেম নামক যে সর্বোচ্চ আদর্শের বাণী গীতিকাগুলির মূল ভিত্তি - সেই প্রেম উৎসারিত হয়েছে হিন্দু ইসলাম তথা জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে, তাই দেখি ইসলাম ঈশা খাঁ এর প্রতি বিমুগ্ধা কেদার রায়ের ভগিনীটি, গজদানী ও মমিনা খাতুনের ভালোবাসা উচ্চস্তরে পৌঁছে গেছে। ব্রাহ্মণ পালানায়ক জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেম কর্তৃক আকৃষ্ট হয়েছে, আবার ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুয়া, সুরতমালের প্রেমে পতিত হয়েছে, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক প্রীতির বন্ধনে জড়িত হয়ে মহান প্রেমের চিত্র অঙ্কন করে গেছে উক্তপালার নায়ক-নায়িকারা।

আবার, পূর্ববঙ্গ - ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিতে পল্লীবাংলার অপরূপ শোভাও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকৃতি মধ্যযুগের অন্যান্য সাহিত্যের প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্নরূপে প্রকাশিত। সাধারণত দেখা যায় যে, নায়িকার মানসপট উদ্‌ঘাটনের উদ্দীপন বিভাবরূপে সেখানে প্রকৃতি উন্মোচিত, কিন্তু পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকায় প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিসর্গ প্রকৃতির রূপে চিত্রিত, চিরপরিচিত দৃশ্যের মধ্যে পালার নায়ক-নায়িকারা কর্মব্যস্ত। তাই তো 'বউ কথা কও' পাখীর চিত্রে, পল্লীবাংলার স্নিগ্ধ মায়া মমতাময় কুটিরটির চিত্রে শ্রাবনমেঘে বজ্রবিদ্যুৎসহ বর্ষণ চিত্রে ফুটে ওঠে সেই চিরপরিচিত বঙ্গের রূপটিই। ফলে অপূর্ব চিত্রকল্পের সৃষ্টি হয় পাঠকমনে।

আবার পালাকারগণ বহু সত্যঘটনাকে অপূর্ব কবিত্বময় প্রকাশ ভঙ্গীমার মাধ্যমে গীতিকায় স্থাপন করে গেছেন। যেমন- মলুয়া পালায় দেখা যায়, নায়িকা মলুয়া ক্ষিপ্ততার সঙ্গে আপন ভ্রাতাদের ক্ষুদ্র একটি নৌকায় সবেগে উঠেছে ---

"পঞ্চভাইয়ে পত্র পাইয়া পান্‌সী নাও করে।
ছল করিয়া তারা কোড়া শিকার ধরে।।"[১০]

এটি সত্য ঘটনা অথচ প্রকাশরীতির মাধুর্যে অনবদ্য। আবার কবিত্তগুণহীন বহুপালার নিদর্শন ও পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকায় পাওয়া যায়। তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে অহেতুক কলহ-প্রতিবাদ, বলশালী হস্তিকে শক্তির নিগঢ়ে বাঁধার প্রচেষ্টা, জমিদারদের কার্যকারণহীন বিরোধ ইত্যাদিতে নেই যেমন লিরিকের আমেজ তেমনই মহৎ কবিত্বগুণ।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি পালাই মানবজীবনবোধ থেকে আহৃত হয়ে গীতিকার অঙ্গ হয়েছে। ফলে, গীতিকাগুলি মানবহৃদয়ে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। আর এরই সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে করুণ কবিত্বরসের উপলবন্ধুর ধারা, সংযম-সহিষ্ণুবোধও। তাই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, ধর্মীয় শাস্ত্রবোধের কাঠোর নিষেধাজ্ঞায় যখন প্রেমকে গর্হিত অপরাধ বলে চিহ্নিতকরণ করেছে, ধর্মসংস্কারে জর্জরিত, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রবক্তাগণ; তখন উন্মুক্ত বাতায়ন পথে আদর্শ প্রেমের সরলতা, সজীবতা, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার আগমন ঘটিয়ে পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহ গীতিকাগুলিতে নব আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে - একথা সকল সমালোচক - পাঠকগণই স্বীকার করবেন। আর এই কারণেই ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ---

"গাথার অনাবৃত সৌন্দর্য ও নিরাভরন ঐশ্বর্য মধ্যযুগের পুঁথিজীবি সাহিত্যে একান্তই দুর্লভ।"[১১]

তথ্যসূত্র:

১। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, কর্তৃক সংকলিত, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথমখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা - ২১।
২। ঐ 'কমলাপালা', পৃষ্ঠা - ১৫৩।
৩। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র, কর্তৃক সংকলিত, মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রথমখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩, 'কঙ্ক ও লীলা', গর্গের আলয়ে (৩), পৃষ্ঠা - ২৬৮।
৪। তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা - ৭।

৫। তদেব, মলুয়াপালা।
৬। তদেব, ভূমিকা অংশ পৃষ্ঠা - ৮।
৭। তদেব, , মলুয়াপালা, পূর্ব্বরাগ (৩), পৃষ্ঠা - ৫৪।
৮। তদেব, চন্দ্রাবতীপালা, চন্দ্রার নির্জনে পত্রপাঠ (৫), পৃষ্ঠা - ১০৭।
৯। তদেব, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা - ১৫।
১০। তদেব, মলুয়াপালা, পৃষ্ঠা - ৯০।
১১। বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃষ্ঠা - ২৬০।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

১। বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ।
২। বন্দ্যোপাধ্যায় ড. অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ৩য়-৪র্থ খন্ড।
৩। গুপ্ত ক্ষেত্র, 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়।
৪। সেন শ্রী দীনেশচন্দ্র রায়বাহাদুর, 'মৈমনসিংহ-গীতিকা', প্রথমখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫। সেন ক্ষীতিশচন্দ্র, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা', ৭ম খন্ড।
৬। চক্রবর্তী বরুণকুমার, 'গীতিকা : স্বকজ ও বৈশিষ্ট্য', পুস্তকবিপনি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩।
৭। ভট্টাচার্য ড. আশুতোষ, 'বাংলার লোকসাহিত্য', প্রথম খন্ড, তৃতীয় অধ্যায়, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২।

***